বাংলা শারিয়া - ৩

(নারী-সাক্ষ্য -অসমাপ্ত)

বাংলা শারিয়া, পৃষ্ঠা দশ। "বাংলাদেশে বিবাহ, বিবাহ-বিচ্ছেদ, অভিভাবত্ব প্রভৃতি বিষয়ে বিধিবদ্ধ আইন বর্তমান (আমার কথা - সেগুলো কি শারিয়া আইন?)। কিন্তু সেগুলির প্রয়োগ পদ্ধতি ইসলামী আইন অনুসারী নহে। যেমন বাংলাদেশে বিবাহ-বিচ্ছেদ মামলা অমুসলিম বিচারক করিতে পারেন এবং সেই বিচারে ইসলামী সাক্ষ্য আইনের ব্যবহার নাই"।

দু'টো জিনিস আমরা পাচ্ছি এখানে, - (১) তালাকের মামলা অমুসলিম বিচারক করতে পারবে না, এবং (২) ইসলামি সাক্ষ্য-আইনের ব্যবহার।

(১)

মুসলমানের তালাক-মামলায় কোন অমুসলিম পন্ডিত কেন বিচারক হতে পারবে না? দুনিয়ায় উঁচুস্তরের বহু অমুসলিম আইনবিদ আছেন যাঁরা শারিয়ায় সবিশেষ বিশেষজ্ঞ। অমুসলিমরা যদি শারিয়া, এমনকি আল্লার কোরাণ পড়তে পারেন, গবেষণা করতে পারেন, অনুবাদ করতে পারেন তাহলে শারিয়ার আইন-মাফিক বিচার করতে পারবেন না কেন? অপরাধ, সমাজ-বিজ্ঞান, আইন,- এগুলো ফিজিক্স কেমিষ্ট্রির মত বিষয় মাত্র। এ এমন কিছু অলৌকিক বস্তু নয় যে মুসলমান হলেই মাথায় ঢুকবে আর অমুসলমান উকিল-মোক্তার-বিচারক তা বুঝতে পারবে না। (অমুসলিমের কাছে কোরাণ বা আয়াত সম্বলিত বই বিক্রী হানাফি আইনে অনুমোদিত, কিন্তু শাফি আইনে সেটা নিষেধ - আইন নম্বর k1.2.(e) পৃষ্ঠা ৩৭৯। এটা খোদ কোরাণেরই লংঘন কেননা কোরাণ নিজেই এ ব্যাপারে মুসলিম-অমুসলিমের ব্যবধান রাখেনি ঃ - "যারা পাক-পবিত্র তারা ছাড়া আর কেউ একে স্পর্শ করবে না" - সুরা ওয়াক্বিয়া আয়াত ৭৯)

হ্যাঁ, যদি অমুসলিমের প্রতি ঘৃণাভিত্তিক বিদ্বেষ থাকলে তবেই তাঁরা মহাপন্ডিত হলেও বিচারকের আসনে অচ্ছ্যুৎ। মুখে মুখমিষ্টি কথা বললেও অমুসলিমের প্রতি ওই বিদ্বেষই ভয়ংকরভাবে ছড়ানো ছিটানো আছে জামাতের দর্শনে, তা এ সিরিজে ক্রমশঃ প্রকাশ্য। শুধুমাত্র ধর্ম-বিশ্বাসের ভিত্তিতে এই তারতম্য আসলে অনৈসলামিক বর্ণবিদ্বেষ ছাড়া আর কিছুই নয়। অসংখ্য অমুসলিম আইন-বিশেষজ্ঞ আছেন পাশ্চাত্যে যাঁদের শারিয়া-গবেষণা মুসলিম শারিয়াবিদদের চেয়ে মোটেই কম নয়। তাঁদের অনেকে শারিয়ার কিছু কিছু বিষয়ের প্রশংসাও করেন, সেগুলো আবার জামাতিরা হৈ হৈ করে প্রচারও করেন। তাহলে এই অন্যায় নিষেধ কেন? শারিয়ার মেরামতের জন্য যেসব অমুসলিম আইনবিদের কাছে ধর্না দিতে হয়, তাঁরা বিচারক হতে পারবেন না, এ তো বড় রঙ্গ যাদু! দেখুন নীচেঃ-

সারাংশঃ- "পৃথিবীতে ফৌজদারি আইনের সর্বোচ্চ বিশেষজ্ঞদের একজন পেনসিলভেনিয়া ল' স্কুলের প্রফেসর ডঃ পল এইচ রবিনসন মালদ্বীপের জন্য নুতন আইনের খসড়া করিতেছেন। মালদ্বীপ-সরকারের অনুরোধে ইহার খরচ দিয়াছে জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রকল্প। যেহেতু গঠনতন্ত্র অনুযায়ী মালদ্বীপ একটি ইসলামি রাষ্ট্র এবং আইনগতভাবে সকল নাগরিকই মুসলিম, তাই এই আইন হইবে পৃথিবীর প্রথম শারিয়া-ভিত্তিক আধুনিক ফৌজদারী আইন"।

FRONTPAGEMAG.COM
July 26, 2004
Excerpt.

Paul H. Robinson, Professor of Law of University of Pennsylvania Law School and "one of the world's leading scholars on criminal law" is drafting a new criminal code for the Maldives. The work has been requested by the Maldivian government and is sponsored by the United Nations Development Program. Because the Maldives is by constitutional mandate an Islamic nation and, as a matter of law, all citizens are Muslim, the code will be the world's first criminal code of modern format that is based upon the principles of Shari'a. The Maldives is a nation of 1200 islands in the Indian Ocean that has for centuries been a transit point between Africa, the Middle East, and Asia and continues to have strong cultural connections to all three. – End.

হাসি পায়। ছাত্রাবস্থায় শুনেছি ললিতা নামের (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য) সিনেমার কিশোরী নায়িকা ফ্রান্সে বেড়াতে গেলে ফ্রান্সের সিনেমা হলে ঐ একই সিনেমা দেখতে তাকে ঢুকতে দেয়া হয়নি কারণ আইন অনুযায়ি সে তখনও "প্রাপ্তবয়স্কা" হয়নি। এ ব্যাপারটাও হুবহু সেরকম না হলেও একটু বিপ্রতীপ বৈকি!

****

(২)

ইসলামে সাক্ষ্য-আইনের ব্যবহার। অনেক গর্তের মধ্যে এই একটা সুগভীর গর্ত যেখানে শারিয়া এমন হুমড়ি খেয়ে পড়ে যে হাজার বান্না-কুতুব-মৌদুদি'র ঠ্যাকা দিয়েও সে চিৎপটাং রোধ করা যায় না। কারণ, কোরাণ-লংঘনের এ এক ভয়াবহ জ্বলন্ত উদাহরণ, নারী-বিরোধের সুস্পষ্ট প্রমাণ তো বটেই। প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হকের সময় ১৯৭৯ ও ১৯৮১ সালে পাকিস্তানের আইন হিসেবে শারিয়া গ্রহন করা হয়েছিল, আমি সেই "টেক্সট অফ পাকিস্তান'স হুদুদ অর্ডিন্যান্সেস"-এর "(২) -১৯৭৯ এর অর্ডন্যান্স নম্বর ৭, যাহা ১৯৮০ সালের এর অর্ডিন্যান্স নম্বর ২০ দ্বারা সংশোধিত"- থেকে বাংলায় ভাবানুবাদ করে দিচ্ছি।

হুদুদের শাস্তিযোগ্য জ্বেনা (অবৈধ সম্পর্ক) বা জ্বেনা-বিল-জাব্‌র (ধর্ষন) এর প্রমাণ হইবে নিম্নলিখিত দুইটির একটিঃ- (১) আদালতের সামনে অভিযুক্ত তাহার অপরাধের স্বীকারোক্তি করে, অথবা (২) চারিজন বয়স্ক পুরুষ মুসলিম সাক্ষী পাওয়া যায় যাহারা স্বচক্ষে শারীরিক মিলন দেখিয়াছে।

কথাটা সুস্পষ্ট। উদ্ধৃতিটা নেয়া হয়েছে "ক্রিমিন্যাল ল' অফ ইসলাম অ্যান্ড দি মুসলিম ওয়ার্লড - এ কম্পেয়ারেটিভ পার্সপেক্টিভ" কিতাব থেকে, মিলিয়ে নেয়া হয়েছে অন্য সুত্র থেকেও। বইটা বর্ষীয়ান প্রফেসর ডঃ তাহির মাহমুদের প্রতিষ্ঠিত দিল্লীর ঐতিহ্যবাহী ইসলামী গবেষণা প্রতিষ্ঠান "ইনস্টিটিউট অফ অবজেক্টিভ স্টাডিজ"- এর প্রকাশিত, ওতে বিরাট এক অধ্যায়ে পাকিস্তানের পুরো হুদুদ আইনের উদ্ধৃতি আছে, পড়লে বিবেকবান জামাতি-সদস্যরা জামাতের বিরুদ্ধেই ক্রুদ্ধ বিদ্রোহ করবেন এমন সম্ভাবনা আছে। ওই একই কেতাবে, ২৫১ পৃষ্ঠায় আবারও লেখা আছে - ভাবানুবাদঃ- "অবৈধ সংসর্গ বা প্রাণদন্ডের যোগ্য কোন অপরাধের ক্ষেত্রে নারীর সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নহে"। ইসলামী ফাউন্ডেশনের "বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন" বইয়ের তৃতীয় খন্ডের ৮৮৮ পৃষ্ঠায় আইনটাকে একটু গ্রহনযোগ্য করার প্রচেষ্টা আছে, - "ইবন হাযম লিখিত আল-মুহাল্লা গ্রন্থে উল্লেখ করা হইয়াছে, যেনা প্রমানের ক্ষেত্রে চারিজন ন্যায়পরায়ণ মুসলমান সাক্ষী হইতে হইবে অথবা প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন মুসলিম ন্যাপরায়ণ মহিলা হইতে হইবে"।

কিন্তু এ চেষ্টার পরেও নারীর চাক্ষুষ সাক্ষ্য অন্যায়ভাবে, অনৈতিকভাবে এবং অপমানজনকভাবে পুরুষের অর্ধেক থেকে গেল, আর অমুসলিমের চাক্ষুষ সাক্ষ্যও অন্যায়ভাবে, অনৈতিকভাবে এবং অপমানজনকভাবে সম্পুর্ণ বাদ দেয়া হল। খোদ ইমাম শাফি'ই বলেছেন, ভাবানুবাদঃ-"অস্বাভাবিক শারীরিক সম্পর্কের সাক্ষ্য হিসাবে চারিজন পুরুষ সাক্ষী প্রয়োজন"- পৃষ্ঠা ৬৩৮, আইন নম্বর- ও২৪.৯। আরও একটা উদ্ধৃতি দিচ্ছি, "দি পেনাল ল' অফ

ইসলাম'' বইয়ের (কাজী পাবলিকেসন্স, লাহোর) ৪৪ ও ৪৫ পৃষ্ঠা থেকেঃ- অবৈধ সম্পর্কের মামলায় প্রয়োজনীয় সাক্ষী হইল চারিজন বয়স্ক পুরুষ, নারীদের সাক্ষ্য এই ক্ষেত্রে গ্রহনযোগ্য নহে। বোধশক্তির দুর্বলতা, স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা ও (পরিস্থিতিকে) আয়ত্তে রাখিবার ক্ষমতার অভাবের জন্যই নারীদের সাক্ষ্য প্রথম হইতেই গ্রহনযোগ্য নহে''। অধুনা ইন্টারনেটের অনেক ওয়েবসাইটে আর মওলানাদের বইতে এই একই ভাবে নারীর সাক্ষীকে নির্লজ্জভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। আরও দেখুনঃ- যেসব বিচারকের কাছে এই মামলা পেশ করা হয়, তারা প্রমাণের জন্য চার জন যোগ্য সাক্ষী তলব করবেন এবং এই সাক্ষীদের পুরুষ শ্রেণীভুক্ত হওয়াও জরুরী। এ ব্যাপারে নারীদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় - পৃষ্ঠা ২৪১, বাংলা কোরাণ, মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।

লজ্জা, লজ্জা! নিজেদের মা-বোনের প্রতি লজ্জা!

না, ভুল হল। লজ্জিত হতে হলে লজ্জাবোধ থাকতে হয়। ওটা জামাতিরা হারিয়ে ফেলেছে অনেক আগেই।

এবারে, আদালতে এ আইনের প্রয়োগ।

সুতরাং, শারিয়ার অবৈধ সম্পর্কের মামলায় চারজন বয়স্ক মুসলিম পুরুষ সাক্ষী লাগবে, নারীদের সাক্ষ্য চলবে না। আমরা এটাও দেখলাম, বাংলাদেশের বিধিবদ্ধ শারিয়ার বাংলা বইতে দুর্বল সুত্রে হলেও নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার ভালো একটা অসম্পুর্ণ চেষ্টা আছে, ''প্রতিজন পুরুষের পরিবর্তে দুইজন মুসলিম ন্যায়পরায়ণ মহিলা হইতে হইবে''। আরও খোলাসা করে বলা আছে, ''যেমন তিনজন পুরুষ ও দুইজন মহিলা বা দুইজন পুরুষ ও চারিজন মহিলা অথবা একজন পুরুষ ও ছয়জন মহিলা বা শুধুমাত্র আটজন মহিলা''। অন্যান্য দেশে প্রচলিত শারিয়ায় এটা নেই কেন, একই ইসলামের বিভিন্ন আইন কেন, তা বলা থাকলে ভালো হত। এমনিতেও একই ব্যাপারে নানা রকম ইসলামী আইন হলে তার মানেই দাঁড়ায় দুনিয়ায় নানা রকম ইসলাম আছে। কিন্তু কথা সেটা নয়। কথা হল, আইন তৈরী করেন পন্ডিতেরা। আর প্রয়োগ করেন উকিল-মোক্তারেরা। উকিল-মোক্তারের মত ত্যাঁদোড় পেশা দুনিয়ায় আর নেই। আইনের ভেতর সূঁচের ছিদ্র পেলেই তাঁরা সেখান দিয়ে অবলীলাক্রমে হাতী পার করে দেবেন। বিধিবদ্ধ শারিয়ার এই প্রচেষ্টায় তেমনি ছোট-বড় দু'টো ছিদ্র রয়ে গেছে।

ছোট ছিদ্রটা হল, ন্যায়পরায়ণ মহিলা কাহাকে বলে কত প্রকার ও কি কি তা নিয়ে আদালতে বিশ্বযুদ্ধ সৃষ্টি করা উকিল-মোক্তারের পক্ষে ডাল-ভাত। তাঁরা হৈ হৈ করে ''প্রমাণ'' করবেন - আদালতে উপস্থিত মহিলা-সাক্ষীটা খুবই ''অন্যায়পরায়ণ'' বলে তার সাক্ষ্য গ্রহনযোগ্য নয় কেননা সে অমুক দিন পুরুষ সহপাঠির সাথে নিউমার্কেটে বই কিনতে গেছে কিংবা বেগানা পুরুষের সাথে বায়তুল মোকাররমে ঘুরেছে। আর বড় ছিদ্রটা হল, রোকেয়া হলে ধর্ষণের মামলায় যদি সাতজন মেয়ের চাক্ষুষ সাক্ষী থাকে, তবে ধর্ষক সবার সামনে অট্টহাসি হাসতে হাসতে পগার পার হয়ে যাবে। প্রশ্নটা মোটেই উড়িয়ে দেবার মত নয়। এই দেখুন বাস্তব প্রমাণঃ- এন-এফ-বি'র বরাতে দৈনিক ষ্টার, ৭-ই জুলাই ২০০৩। কল্যাণপুরে মা-কে বেঁধে কিশোরী মেয়েকে ধর্ষণ করা হয়েছে শেষ রাতে। ধর্ষণের একমাত্র সাক্ষী হল মেয়ের মা, ধর্ষক হল স্থানীয় তিন লোক। এখন এই মামলা যদি শারিয়া কোর্টে ওঠে তবে শারিয়ার আইন অনুযায়ী এক নারীর সাক্ষ্যে ধর্ষকদের শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়। গ্রামের নির্জন ধানক্ষেতে ধর্ষিতা অভাগিনীদের একক সাক্ষ্যেও সম্ভব নয়।

আমি যুক্তির কথা বলছি। আমি সাধারণ কল্যাণবোধের, ন্যায়ের এবং মানবতার কথা বলছি। আজকাল বাংলাদেশে ধর্ষকদের পোয়াবারো। গ্রামের গরীব বাপ-মায়ের মেয়েগুলো যেন মাস্তান ছেলেগুলোর লুটের মাল, ওদের বাঁচাবার জন্য মুরুব্বী নেই, পুলিশ নেই, আদালত নেই, সরকার নেই, আমরাও নেই। আইনটা মেরামত করে ডি-এন-এ পরীক্ষাকে অন্তর্ভুক্ত করে ধর্ষকের শাস্তি সম্ভব নয় কারণ আগের নিবন্ধে দেখিয়েছি, হুদুদ হল যেন

হাজার ভোল্টের ইলেক্ট্রিক তার, ওতে হাত ছোঁয়াবার উপায় নেই কারো। কারণ, "কোন মুসলিম নেতা, আইনবিদ বা ইসলামী বিশেষজ্ঞ, এমনকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ঐক্যবদ্ধ হইলেও বিন্দুমাত্র রদবদল করিতে পারিবে না"।

এই "রদবদল করিতে পারিবে না"-টা রাজনৈতিক ইসলামকে কি মারাত্মক ভাবে যাবজ্জীবন কারাদন্ডে দন্ডিত করে রেখেছে, কিভাবে বিশ্ব-মুসলিমকে পেছনে টেনে রেখেছে তার জ্বলন্ত উদাহরণ বিপুলভাবে ছড়িয়ে আছে পাকিস্তান-নাইজিরিয়ার সরকারী আদালত থেকে শুরু করে আমাদের গ্রামের ফতোয়াবাজীর আদালত পর্য্যন্ত। সামনে বিপদ দেখলে বড়ই সোহাগের প্রেমিকাটাকে গর্ভবতী অবস্থায় অসহায়ভাবে পেছনে ফেলে বিদ্যুৎবেগে চম্পট দেয়াটা আবহমান পুরুষ-সংস্কৃতি, তা মানুষই হোক বা পশু-ই হোক। অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশন্যালের মুখ থেকে পুরোটাই শুনতে পারবেন। আমিনা পরকীয়া প্রেমে সন্তানের মা হয়েছে বলে শারিয়া আদালতের রায়ে পাথরের আঘাতে মৃত্যুদন্ড পেয়েছিল। শারিয়ার আদালতে হতভাগিনী শপথ করে যে প্রেমিকের নাম বলেছে, সে ব্যাটা ছাড়া পেয়ে গেছে কারণ সে নিজের অপরাধ সটান অস্বীকার করেছে, যেন ধোয়া তুলসীপাতা আর কি। আর চারজন মুসলমান বয়স্ক পুরুষের চাক্ষুষ সাক্ষী তো পাওয়াই যায় নি, কোনকালে যাবেও না। আমাদের গ্রামের অজ্ঞ মোল্লা শারিয়ার আইন জানে না বা অপপ্রয়োগ করে, এ কথাটাও ঠিক নয়। পরে অন্যান্য ঘটনায়ও আমরা দেখব ফতোয়াবাজেরা শারিয়ার আইনই প্রয়োগ করে, সে আইন এড়িয়ে যাবার বা নুতন আইন বানাবার মত বুকের পাটা ওদের নেই। মোটামুটি ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্য্যন্ত বাংলাদেশে চার বছরে ৩৪৮টি গ্রাম্য ফতোয়ার ঘটনা খবরের কাগজে উঠেছে (শিক্ষা ও সাংস্কৃতক চর্চা কেন্দ্রের "ফতোয়া - ১৯৯১ - ১৯৯৫"। আসল সংখ্যা নিশ্চয়ই আরও অনেক বেশী) এর ভেতরে আছে প্রচুর অবৈধ সংসর্গের ফতোয়া, যার পুরো শাস্তি পেয়েছে শুধু নারীরা-ই। দু'একটা ছাড়া কোন পুরুষের শাস্তি হয়নি, নারীর সাক্ষ্য কোনই কাজে আসেনি - আসবেও না।

তাই মানবতার ও ন্যায়বিচারের রক্তাক্ত লাশের ওপর গৃধিনীর হিংস্র চীৎকারে উদ্বাহু নৃত্যে চিরকাল শারিয়ার হবে জয় জয়কার। শারিয়ার আইনে প্রেমিকা খুন হবে পাথরের আঘাতে, রক্তাক্ত হবে বেতের আর ঝাঁটার আঘাতে, অসহ অপমানে আত্মহত্যা করবে আর প্রেমিক অন্য প্রেমিকা জুটিয়ে বগল বাজিয়ে বেড়াবে দুনিয়ার সামনেই।

একেই বলে মুসলমানের সখাত সলিল। যুগান্তরের ওপারের মরু-সমাজের কিছু ঘটনার ওপরে তাৎক্ষণিক কিছু বিধানকে আল্লা-রসুলের নামে বিশ্ব-মুসলিমের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে চিরকালের জন্য। ভারতের আসগর আলী ইঞ্জিনিয়ারের মত কত ইসলামী দার্শনিক কত না চীৎকার করে যাচ্ছেন এর বিরুদ্ধে। কোরাণের অনুবাদকারী মহাম্মদ আসাদ তীব্র ভাষায় আক্ষরিক ভাবেই বলেছেন যে উন্মাদ না হলে, মাথা ঠিক থাকলে (ইন ইনসেন মাইন্ড) শারিয়ার চার সাক্ষীর আইন বানানো সম্ভব নয় । কিন্তু কে শোনে কার কথা। কেতাবের অক্ষর, শব্দ আর বাক্যগুলোই ইসলাম হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক ইসলামের হাতে, তার অন্তর্নিহিত দর্শনটা নয়।

অথচ কোরাণের ঘটনা-নিরপেক্ষ মানবিক মুল্যবোধের আয়াতগুলো নিয়ে শারিয়া বানালে তখনই বিশ্ব-মানবকে চিরকালের জন্য এখনকার ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস দিতে পারত মুসলমানেরাই, দুনিয়াকে এত শতাব্দী অপেক্ষা করতে হত না। দুনিয়ার অনেক আইনেই কোরাণের চিরন্তন মানবিক মুল্যবোধ সাফল্যের সাথে প্রতিফলিত আছে। ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দেশগুলোর গঠনতন্ত্রে আর ইউনিভার্সাল ডিক্লারেশন অফ হিউম্যান রাইটস্-এর ১৮ নম্বর আর্টিকেল-এ হুবহু কোরাণের বাণী লেখা আছে- লা ইক্‌রাহা ফিদ-দ্বীন, লা'কুম দ্বীনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন। দুর্ভাগ্য, হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী-তে বিশ্ব-শান্তির অন্ততঃ একটা দিগ্‌দর্শন যা থেকে পাওয়া যেত, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের সেই চমৎকার আয়াত দু'টোর জায়গা হয়নি শারিয়ায়।

চারজন পুরুষ সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা বলা আছে বিশেষভাবে সুরা নূর-এর আয়াত ১১ থেকে ২০ পর্য্যন্ত। আর সাধারণ ভাবে আছে সুরা নিসার আয়াত ১৫-তে। এখানে আয়াতগুলোর উদ্ধৃতি দেয়া হলনা লম্বা হয়ে যাবে বলে,

আপনারা মিলিয়ে নেবেন। সুরা নূরের আয়াতগুলো এসেছে ৫ম হিজরিতে মদিনায়। আয়াতগুলোর বাস্তব পটভূমি আছে মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুহসিন খানের বোখারির অনুবাদে, -৫ খন্ড পৃ-৩১৯ থেকে ৩২৯, হাদিস# ৪৬২। ১১ পৃষ্ঠার বিশাল হাদিস, বিবি আয়েশার বর্ণনা করা। সারাংশঃ- পঞ্চম হিজরির রমজান মাসে বনি মুস্তালিক গোত্রের সাথে গাযওয়ার শেষে নবীজীর কাফেলা ফিরতি-পথে মদিনার কাছেই রাত্রিযাপনের জন্য থেমেছিল। (গাযওয়া- যে জিহাদে নবীজী স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অনুপস্থিতির জিহাদ হল স্যারিয়া। ৪র্থ হিজরিতে দু'টি, ৫ম হিজরিতে পাঁচটি এবং ৬ষ্ঠ হিজরিতে তিনটি গাযওয়া হয়েছে)। তারপরে রওনা হবার সময় বিবি আয়েশা প্রাকৃতিক কারণে দুরে গিয়েছিলেন। তিনি ফিরে এসে দেখেন তাঁর গলার হারটি নেই। তিনি সেটা খুঁজতে যাবার পর লোকেরা ভুল করে তাঁর হাওদার (পাল্কি জাতিয়) ভেতরে তিনি আছেন মনে করে (তিনি ক্ষীণকায়া ছিলেন) সেটা উটের পিঠে চড়িয়ে কাফেলা রওনা হয়ে যায়। তিনি হারটি পেয়ে ফিরে এসে কাফেলা না দেখে সেখানে অপেক্ষা করতে করতে ঘুমিয়ে পড়েন এবং সারারাত ঘুমিয়ে থাকেন। সেকালে প্রতিটি কাফেলার কিছুটা পেছনে একজন লোক হেঁটে আসার রেওয়াজ ছিল, যাতে কিছু খোয়া গেলে তা পাওয়া যায়। এ ক্ষেত্রে ছিলেন সাফওয়ান (ক্রীতদাস- ইবনে হিশাম থেকে) তিনি সকালে সেখানে পৌঁছলে বিবি আয়েশা সাফওয়ানের উটে চড়েন এবং সাফওয়ান উটের (সামনে বা পেছনে, বিতর্ক আছে) সাথে হেঁটে হেঁটে কাফেলার কাছে পৌঁছান। পরে এই নিয়ে একদল লোক, প্রধানতঃ আবদুল্লা বিন উবাই, মিশতাহ আর হাসান বিন থাবিত কানাঘুষা ও অপবাদ শুরু করে। কোন কোন সুত্রে এই তিনজনের সাথে নবী-পত্নী জয়নাবের বোন হামনার নামও পাওয়া যায়। অর্থাৎ সব মিলে তিনজন পুরুষ আর একজন নারী হল। বিবি আয়েশা বাপের বাড়ী চলে যান এবং অত্যন্ত মানসিক কষ্টে দিন কাটাতে থাকেন। মাসখানেক ধরে অনেক তর্ক-বিতর্ক ও সংবেদনশীল ঘটনার পর নবীজী তাঁর বাসায় এলে বিবি আয়েশা এবং তাঁর বাবা-মা', এই তিনজনের সামনেই সুরা নূরের ১১ থেকে ২০ পর্য্যন্ত দশটা আয়াত নাজিল হয়। আয়াত নাজিলের পরে, বোখারির উদ্ধৃতিঃ-"আমার মাতা আমাকে বলিলেন- তাঁহার (নবীজীর) কাছে যাও। আমি বলিলাম-আল্লাহ'র নামে, আমি তাঁহার কাছে যাইব না এবং আমি আল্লাহ ছাড়া কাহারও প্রশংসা করি না। সে জন্যই আল্লাহ এই দশটি আয়াত নাজিল করিয়াছেন (সুরা নূর, আয়াত ১১ হইতে ২০ পর্য্যন্ত)। আল্লাহ আমার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যই কোরাণের ওই আয়াতগুলি প্রেরণ করিয়াছেন" - শেষ। অর্থাৎ আয়াতগুলো এসেছিল ওই তাৎক্ষণিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে বিবি আয়েশার নির্দোষিতা প্রমাণের জন্যই। ভেবে দেখুন, কার সাথে কি! কোথায় চোদ্দশ' বছর আগের নির্দোষিতা প্রমাণের একটা ঘটনা, আর কোথায় জ্বেনার আদালতে চিরকালের নাকচ নারীর সাক্ষ্য! এরই ভিত্তিতে চিরকালের জন্য মা-বোনের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে নির্লজ্জ ভাবে কি করে অস্বীকার করব আমরা?

এবারে সুরা নিসার পটভুমি, অর্থাৎ কন্টেক্সট। নিসা-র ১৫ নম্বর আয়াতটায় চার সাক্ষীর যে শর্ত, সেই ব্যাপারের উদ্ধৃতিঃ- "এ শর্ত আরোপের কারণ, যাতে স্ত্রীর স্বামী, তার জননী অন্য স্ত্রী অথবা ভাই-বোন ব্যক্তিগত জীঘাংসার বশবর্তী হয়ে অহেতুক অপবাদ আরোপ করার সুযোগ না পায় অথবা অন্য অমঙ্গলকারী লোকেরা শত্রুতা-বশতঃ অপবাদ আরোপ করতে সাহসী না হয়।"- উদ্ধৃতি শেষ। এই আয়াতে "ফাহিসাহ্" শব্দটা জ্বেনা ছাড়াও প্রকাশ্য অশ্লীল কাজ, - প্রকাশ্য মন্দকাজ, -সুস্পষ্ট নির্লজ্জ কাজ,- এ ধরণের ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে সুরা আরাফ আয়াত ২৮, সুরা আহযাব আয়াত ৩০ আর সুরা ত্বালাক আয়াত ১ -এ।

শারিয়ার সাক্ষ্য-আইন ওই ব্যাপক অর্থ বা ওই বিশেষ পটভুমি লংঘন করেছে, অন্যান্য অনেক আইনের মত এখানেও সাংঘাতিক রকমের আউট অফ কন্টেক্সট হয়েছে। ওহুদ যুদ্ধের পর মেয়েদের ও এতিমদের ওপরে নানা রকম অত্যাচার-অনাচার হচ্ছিল, মেয়েদের ওপরে খামাখা অপবাদও হচ্ছিল খুব। সেই অনাচারের বিরুদ্ধে তর্জনী তুলে দাঁড়িয়ে গেল এই আয়াত, এটাই এই আয়াতের একমাত্র পটভুমি। অত্যাচারী পুরুষতন্ত্রের জোঁকের মুখে একসাথে পড়ল নুন আর হুঁকোর পানি, কচ্ছপের মত মুখ ঢুকিয়ে ফেলল সে খোলসের ভেতর। অপছন্দের বৌগুলোকে চরিত্রহীনতার অপবাদ দিয়ে আগে বেশ ঝেড়ে ফেলে পার পাওয়া যেত, এখন আনতে হবে

চার-চারজন পুরুষ সাক্ষী। না হলে পশ্চাদ্দেশে সবেগে বেত্রাঘাত।

ভাবতে অবাক লাগে, যে আয়াতগুলো এসেছিল নারীদেরকে বিশেষ ঘটনায় পুরুষের নাহক হিংস্র ছোবল থেকে বাঁচাতে, সে একই আয়াত আজ কালনাগের মত এঁটে বসেছে নারী-অধিকারের গলায় চিরকালের জন্য। ইসলামের সে আইনদাতা, সে আইনের ব্যাখ্যাদাতা আজ নেই। তাই চলেছে নারী-সম্ভ্রমের হরির লুট, তাঁরই নামে।

সেই পরিস্থিতিতে যা ছিল তা ছিল, পস্পরবিরোধী তথ্যে-তত্ত্বে সে দলিলগুলো এতই বিকৃত করা হয়েছে যে তার সম্পুর্ণ ছবি আমরা কোনদিনও পাব না। কিন্তু নিঃসন্দেহে বলা যায় যে মানবাধিকার-সচেতন বর্তমান বিশ্বে যদি তিনি ফিরে আসতেন তবে কখনো তিনি মা-বোনের চাক্ষুষ সাক্ষ্যকে নিয়ে অসম্মানের এ নিষ্ঠুর কালখেলা খেলতেন না। নিজে তো করতেনই না, কেউ করলেও জুলফিকার হাতে দাঁড়িয়ে যেতেন। তাই বুঝি বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছিলেন, একমাত্র ঐ নেতাটা ফিরে এলেই মানবতার বর্তমান অধঃপতন রোধ করা সম্ভব। পয়গম্বর হিসেবে নয়, এক অবিশ্বাস্য নেতৃত্বের নেতা হিসেবেই কথাটা বলেছিলেন তিনি।

সে অযোধ্যা নেই সে রামও নেই । কিন্তু মাহমুদ তা'হা-দের ইসলামী চোখে আছে মানবতার স্বপ্নীল রামধনু। আর গোআজম আর মত্যানিজামীদের পিছলামি হাতে আছে নারী-সম্ভ্রম আর নররক্ত-সিক্ত রক্তাক্ত রাম দা'।

এবার একটু মুখ বদলানো যাক। তারপর এই শিবের গীতের ভেতর দিয়েই শেষের দিকে আমরা আবার নারী-সাক্ষ্যের ধান ভানব।

নিজের বাচ্চা আর পরের বৌ নাকি পুরুষের একেবারে জানের জান। বিয়ের দু'চার বছরের মাথায় কর্ণকুহরে কুহেলী কুহরিত হয়, - "হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে........ ঘরেতে এলোনা সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া....... " -(কবিগুরু)। নিষিদ্ধ ফল তো সর্বদাই সুস্বাদু। অপ্রতিরোধ্য তার আহ্বান, একেবারে যেন হ্যামিলনের যাদুর বাঁশী। তাই বুঝি নিষিদ্ধ ফল গন্ধমের অমোঘ আকর্ষণে মানুষ ছিট্‌কে পড়েছে বেহেশ্‌ত থেকে দুনিয়ায়, তাই বুঝি মানুষের ইতিহাস পরিপুর্ণ হয়ে রয়েছে আবেগ থেকে কাম, কাম থেকে অপরাধ আর অপরাধ থেকে শাস্তি পর্য্যন্ত, মহাভারতের মুনিঋষি-দেবতা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিক পাদ্রী আর কোরাণের গৃহশিক্ষক, পরনারী রাধার সাথে শ্রীকৃষ্ণের প্রচুর গোপীকামিনী - কবিগুরুর নষ্টনীড় আর তারাশংকরের মরমী অনন্যা সেই ঠাকুরঝি (উপন্যাস-কবি) -সম্রাট অষ্টম জর্জের মিসেস সিম্পসন, ডঃ জিভাগো-র ল'রা, কোরাণে জুলেখার প্রবল "ওয়ান সাইডেড"'র হজরত ইউসুফ আর যার জন্য সুবিশাল সাম্রাজ্য ত্যাগ, প্রাচীন চীনের সম্রাট শু-চি'র সেই সড়কিয়া, অর্থাৎ রাস্তার পতিতা প্রেয়সী পর্য্যন্ত । তারপর যখনি থরথর আবেগ-কম্পিত "অন্তর কেবল, - অঙ্গের সীমান্ত-প্রান্তে উদ্ভসিয়া উঠে" (কবিগুরু), যখনি সিন্ধু বাউল পরস্ত্রী হয়ে গান ধরেনঃ-

"এই যে শরীর, এই বিছানা, একঘেয়েমী ভরা,..... চেনা স্বামীর একঘেয়ে সেই চেনা রমণ করা.....
এই শরীরেই অসহ্য সুখ নিত্য নুতন সাজে,.... উছলে উঠে তাহার হাতে মোহনবীণায় বাজে...."(অনুবাদ আমার)

তখনি সচকিত হয়ে ওঠে সমাজের নৈতিক কাঠামো। সচকিত হয়ে ওঠে কোরাণ, বজ্র-গম্ভীর উচ্চারিত হয় -"ব্যাভিচারিনী নারী ব্যাভিচারী পুরুষ; তাদের প্রত্যেককে একশত করিয়া বেত্রাঘাত কর........ "। উদ্যত তর্জনীতে ছুটে আসে রক্তচক্ষু শারিয়া- "যদি অপরাধীর ক্ষমতা ছিল সৎ থাকিবার, তবে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড........

এটা কেমন হল? কোরাণে শারিয়ায় তফাৎ কেন হল? কোথাও কি কুশের মত ছোট্ট অথচ তীক্ষ্ম কিছু অদৃশ্য থেকে

যাচ্ছে? কোথাও কি কোন একটা সুক্ষ্ম কারণ আছে বলে মনে হচ্ছে, কিন্তু ঠিক ধরে উঠতে পারা যাচ্ছে না? যেটা নিয়ে সাক্ষ্য সেটা হল ব্যাভিচার, পুরুষ-নারীর পারস্পরিক সম্মতিক্রমে অবৈধ পরকীয়া। সারা কোরাণে মাত্র একটা শব্দ দিয়ে দু'জনকে-ই অপরাধী বলা হয়েছে, জ্বেনা। অন্য শব্দটা হল ফাসিহা অর্থাৎ অশ্লীল, যার ভেতরে ব্যাভিচারও ধরা যেতে পারে। শারিয়ায় জ্বেনা শব্দটার ব্যাখ্যা কি?

"কোন পুরুষ ও নারী পরস্পরের সহিত বৈধ বিবাহে আবদ্ধ না হইয়া যদি ইচ্ছাকৃতভাবে শারীরিক সংসর্গ করে তবে তাহার জ্বেনা করিয়াছে বলিতে হইবে"। - শাস্তি - মৃত্যু বা এক'শ বেত্রাঘাত। আর ধর্ষণ হল জ্বেনা-বিল-জাব্‌র। "একপক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, সম্মতি ব্যতীত, জোর করিয়া সম্মতি আদায় করিয়া (ইত্যাদি) সংসর্গ করিলে তাহা জ্বেনা-বিল-জাব্‌র হইবে - ধর্ষকের শাস্তি মৃত্যু বা এক'শ বেত্রাঘাত"। {পাকিস্তান হুদুদ অর্ডিন্যান্স, সেকশন ২০, ১৯৮০- (৫এর ১-এ-বি, ২ এবং ৩) ও (৬ এর ১-এ-বি-সি-ডি, ২ এবং ৩-এ-বি)}

চমৎকার, তাই না? এই তো হল ন্যায়বিচার। ধর্ষক শালাদের শাস্তি তো হওয়াই উচিত, পারলে ডবল মৃত্যুদন্ড হওয়া উচিত। "ব্যাটারে শুলে বিঁধে, কারার মাঝে করিয়া রাখো রুদ্ধ"- (কবিগুরু)। কিন্তু শারিয়ার আইনে ঘাপলাটা আছে এর পরেই, মহা ঘাপলা আছে।

সেকশন ৮, এ-বি। "হুদুদের শাস্তিযোগ্য জ্বেনা বা জ্বেনা-বিল-জাব্‌র এর প্রমাণ হইবে নিম্নলিখিত দুইটির একটিঃ-

(এ) অভিযুক্ত যদি কোর্টে অপরাধের স্বীকারোক্তি প্রদান করে।

(বি) কমপক্ষে চারিজন বয়স্ক মুসলমান পুরুষ যৌনকর্মের চাক্ষুষ সাক্ষ্য দেয়, যাহাদের প্রতি কোর্ট সন্তুষ্ট (তাজকিয়াহ আল-শুহুদের ব্যাপারে ইত্যাদি)"।

হল? সাফ কথা। শুধু পারস্পরিক সম্মতির উত্তপ্ত পরকীয়াতেই নয়, বলপুর্বক ধর্ষণেরও সাক্ষী লাগবে ওই চারজন মুসলমান পুরুষ। পাগলামী নয় ?

ফলাফল? ভয়াবহ। কারণ এ আইন অলস বাক্য নয়, এ আইনের বিষাক্ত ছোবলে মর্মন্তুদভাবে নিষ্পেষিত হয়েছে এবং আরও হবে আমাদের অনেক হতভাগিনী ধর্ষিতা বোন। আমরা আল্লার আইনের নামে ওদের লিল্লা করে দিয়েছি এবং আরও দেব। আর জামাতের দাঁড়ি-টুপি-আলখাল্লা দেখে নূরাণী চেহারায় মুখস্থ করা দু'টো আরবী কলমার সাথে মুখস্থ করা বাংলা তর্জমা শুনে ভুলব। এখনো আমরা রুখে না দাঁড়ালে আবার ছোবল দেবে এ সাপ, আমাদেরই অলসতার গাফিলতির জন্য। অ্যাকশনের যদি দায়িত্ব থাকে, ইন্যাকশনেরও দায়িত্ব থাকবে মানুষের আদালতে না হলেও অন্য কোথাও। ছাড় নেই, আমাদের কোন পরিত্রাণ নেই সেখানে।

হুদুদের মামলাগুলো হল ফৌজদারী। ফৌজদারী মামলাতে সাধারণভাবে চাক্ষুষ সাক্ষী পাওয়া যায় না, পারিপার্শিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করে অপরাধীকে শাস্তি দিতে হয়। কিন্তু শারিয়ার হুদুদ শুধু চাক্ষুষ সাক্ষী-নির্ভর, পারিপার্শিক প্রমাণের কোন কথাই হুদুদে নেই। কোরাণেও নেই শুধু আছে দিক-নির্দেশনা - তোমরা বুদ্ধি-বিবেক ব্যবহার করবে, - তথ্য সম্বন্ধে খোঁজ-খবর নেবে। হুদুদ ছাড়া শারিয়ার অন্য যে অংশ তাজি'র, সেখানে ওটা চলবে। কিন্তু পরিবর্তন-পরিবর্ধন করা যাবে না বলে হুদুদে পারিপার্শিক প্রমাণ যোগ করা অসম্ভব। পারিপার্শিক প্রমাণের ওপর নির্ভর করে হুদুদ মামলায় কোনদিন কারো শাস্তি হয়েছে কি? আমি জানি না, সম্ভবতঃ সেটা সম্ভবই নয়।

কোরাণের আয়াতটা কোন অসম্ভবের উন্মাদ-আইন নয়। ওটা নারীদের ওপরে নাহক অপবাদের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচ। সেই রক্ষাকবচকে নিষ্ঠুরভাবে নারীর গলার ফাঁস বানানো হয়েছে। যত অবিশ্বাস্যই মনে হোক, এর

জন্য ধর্ষিতাকে চার সাক্ষীর অভাবে পরকীয়ার দোষে দোষী হতে হয়। এবং পেতে হয়, মৃত্যুদন্ড বা বেত্রাঘাত। দোষ ফতোয়াবাজের নয়, দোষ সম্পূর্ণটাই শারিয়ার। বাস্তব প্রমান দেখাচ্ছি বাংলাদেশ থেকেই। কারণ প্রায়ই আমাদের "দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা' ফেলিয়া .... "। নিরপরাধ অত্যাচারিতের বুকফাটা অভিশাপ বড় কঠিন জিনিস। আল্লাহ'র আরশ কাঁপিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে সেটা, একটা জাতিকে শুন্যে তুলে আছাড় দেবার ক্ষমতা রাখে। বিশ্ব-মুসলিমকে ইসলামের নামে সেই আছাড়ই দিয়েছে জামাত, সে আঘাতে পঙ্গু হবার দশা আজ বিশ্ব-মুসলিমের। মুখে যে যা-ই বলুক এগুলো খাঁটি শারিয়া আইন, কোন রকম ভুল ব্যাখ্যা নয়।

বুক বেঁধে নিন, পাঠক! জামাতের শারিয়ার অভিশাপ স্বচক্ষে দেখে নিন।

১। ধর্ষণকারী, না ধর্ষিতা? ৩০শে আগষ্ট, ২০০২,
দৈনিক প্রথম আলো, দৈনিক যুগান্তর , পাঠকের পাতা,এন-এফ-বি ।

(ভাবানুবাদ) এ ধরণের ঘটনা অত্যন্ত মর্মবিদারক। তার পরেও কি করিয়া এমন একটা ঘটনা বাস্তবে সম্ভব হইল তাহা আমাকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছে। ঘটনার বিবরণ অনুযায়ী মানিকগঞ্জে এক ১৩ বছর বয়সের বালিকা তার বদমাশ সৎ-পিতা দ্বারা ধর্ষিতা হয়। গ্রাম্য-বিচারের ভিত্তিতে স্থানীয় বর্ষিয়ান ব্যক্তিগন ধর্ষক এবং ধর্ষিতা দুইজনকেই জুতা দ্বারা প্রহার করিতে করিতে গ্রাম হইতে বাহির করিয়া দেয়। মানিকগঞ্জ জেলার গাড়পাড়া ইউনিয়নের তেঘুরি গ্রামে এই ঘটনা ঘটে।

আল্লার আইন, তাই না? আল্লার আইনে ধর্ষিতা হতভাগিনী কচি বালিকাকে জুতো-পেটা হতে হবে, তাই না? বটে!!

২. http://bangladesh-web.com/news/jul/01/n01072002.htm#A5
১লা জুলাই, ২০০২:- উদ্ধৃতিঃ- ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতাকে ৮০ বেত্রাঘাত - একজন আটক, দুইজন পলাতক।

সিরাজগঞ্জ- ৩০শে জুন ইউ-এন-বি। সালাঙ্গা থানার চক গোবিন্দপুর গ্রামে সালিসী সভায় ফতোয়া দ্বারা ধর্ষিতা জয়গুন বিবিকে আশীটি বেত্রাঘাত, এবং ধর্ষণকারী হাফিজুর রহমানকে আশীটি বেত্রাঘাত ও দশ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। বিশ বছর বয়স্কা স্বামী-পরিত্যাক্তা জয়গুন তাহার পিতার বাড়ীতে থাকিত। জুন মাসের চার তারিখে গভীর রাত্রে হাফিজুর চার-পাঁচ জন সঙ্গীসহ জয়গুনকে জোরপুর্বক উঠাইয়া নেয় এবং তারাস উপজিলার বিনোদ গ্রামের এক বাড়ীতে রাখিয়া বার দিন ধরিয়া ক্রমাগত ধর্ষণ করে। হাফিজুরের আত্মীয়রা ১৬ই জুন াহাদিগকে চক গোবিন্দপুরে ফিরাইয়া আনে এবং পরদিন সালিসীর ব্যবস্থা করে। মওলানা আবদুল মান্নান এবং গ্রামের বয়স্ক ব্যক্তিবর্গ ধর্ষণকারী ও ধর্ষিতাকে সমান বেত্রাঘাতের শাস্তি দিলে গ্রামে লোকের মনে প্রশ্নের উদয় হয়।-উদ্ধৃতি শেষ।

হ্যাঁ, লোকের মনে মোলায়েম মসৃণভাবে চমৎকার ললিত-প্রশ্নের উদয় হয়। কিন্তু রাগে দুঃখে কেউ ফেটে পড়ে না, এই বিষাক্ত আইনের গলা কেউ চেপে ধরে না। আমাদের মৃত আত্মার জাতি, তাই। না হলে এসব দেশে এরকম ঘটনা একটা ঘটলে আর দু'টোর দরকার হতনা, দেশের লোকেরা আকাশ-পাতাল করে ছাড়ত, চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে সরকার-আদালত-শারিয়া সমেত জামাতকে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলত।

৩। সাপ্তাহিক দেশে বিদেশেঃ- ১৫-ই মার্চ ২০০২:-

চান্দাইকোনা ইউনিয়নের ঐখোলা গ্রামের এক দিনমজুরের দুই কিশোরী কন্যা (১০ ও ১২ বছর) প্রায় এক বছর আগে বেলকুচি উপজিলার খুকলি গ্রামে এক তাঁত ব্যবসায়ীর বাড়িতে কাজ নেয়। ঐ সময় দুই বোন শ্লীলতাহানীর শিকার হয়। এই মর্মান্তিক ঘটনার প্রায় এক বছর পর গ্রাম্য মাতব্বর আবদুর রহমান খান এবং আছাব আলী গত ৬-ই মার্চ সালিসী ডাকেন। সালিসী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন মাতব্বর আছাব আলী। আর ফতোয়া দেবার জন্য ডেকে আনে তুমরাই দাখিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপ্যাল মওলানা আবুবকর সিদ্দীক-কে। মওলানা আবু বকর দুই বোনের মধ্যে বড় বোনের মুখে সম্ভ্রম হারানোর ঘটনা শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন এবং তাৎক্ষণিক ভাবে ফতোয়া দিয়ে তাকে ১০১ ঘা দোররা মারার নির্দেশ দেন। সেখানে উপস্থিত জেল হোসেন নামে এক ফতোয়াবাজ দোররা মারা শুরু করে। প্রায় ৫০ দোররা মারার পর ঐ কিশোরী অজ্ঞান হয়ে যায়। পরে তাকে সুস্থ করে বাকি ৫১ দোররা কার্যকর করে নুর ইসলাম নামে আর এক পাষন্ড। এ অবস্থায় ঐ কিশোরী জ্ঞান হারিয়ে পড়ে থাকে মাটিতে। বড় বোনের শাস্তি দেবার পর ছোট বোনের শাস্তি নির্ধারণের জন্য আবার বৈঠক শুরু হয়।

আল্লার আইন, তাই না? আল্লার আইনে ধর্ষিতা হতভাগিনীদেরকে বেত খেতে হবে তাই না? কার আল্লা এটা? জামাতির?

৪। দৈনিক জনকন্ঠ, ১০ই জুলাই ২০০৩এর খবর। আবারও শারিয়ার বিষাক্ত ছোবলে জুতোপেটা হয়েছে এক ধর্ষিতা। মাদারীপুরের ঘটমাঝি গ্রামের মোফাজ্জল মাতব্বরের পুত্র তোফাজ্জল মাতব্বর তিন সন্তানের মা'কে ধর্ষণ করে। ধর্ষক ধরা পড়ে ও সালিসিতে অপরাধ স্বীকার করে। চরমোনাই পীরের মুরীদ আলী খাঁ'র সভাপতিত্বে রায় কার্য্যকর করা হয়, ধর্ষিতাকে ও ধর্ষককে ৪০ জুতোপেটা, আর ধর্ষকের আরো পাঁচ হাজার টাকা জরিমানা। সালিসশীরা ধর্ষিতাকে তওবা পড়িয়ে স্বামীর হাতে তুলে দিতে চাইলে স্বামী তার স্ত্রীকে গ্রহণ চায় নি, পরে চাপের মুখে গ্রহন করেছে। পীরের মুরিদ বলেছে, এ রায় নাকি সমাজের শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখতে দেয়া হয়েছে, শারিয়া-মোতাবেক দেয়া হয় নি।

পীরের মুরীদ যা-ই বলুক, তার রায় শারিয়ার আইন এবং অন্যান্য ঘটনার রায়ের সাথে হুবহু মিলে যায়। নিজের হাতে আইন তুলে নেয়ার অপরাধের উপলব্ধিও তাদের নেই। আমাদের মৃত জাতির মৃত আত্মা, তাই। নাহলে এসব দেশে এমন একটা ঘটনা ঘটলে হুলুস্থুল বাধিয়ে দিত দেশের মানুষ, আকাশ পাতাল করে ছাড়ত। মানুষের বাচ্চা হলে এসব ঘটনা শুনে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠার কথা। অনেকের ওঠেও। কিন্তু কেন যেন কেউ কিছু করতে পারেননা। ওপরের উদাহরণগুলো গ্রাম বাংলায় ঘটেছে বলে কেউ কেউ বলেন, "ওগুলো হল মূর্খ মোল্লাদের দেয়া ফতোয়া। ওটা আসলে ইসলামী আইনই নয়, ওরা ইসলামের কিছুই জানেনা"।

যদি ওরা ইসলামের কিছুই না জানে, তবে এত শত শত মা-বোনের আর্তনাদ-হাহাকার শুনেও ইসলামের পতাকাধারী জামাত চোখ কান বন্ধ করে এত বছর স্রেফ বসে থাকল কেন? ওই সব মূর্খ মোল্লাদের হাত থেকে ফতোয়া দেবার অধিকার কেড়ে নিজেদের "জ্ঞানী" হাতে নিল না কেন? নিল না কারণ নেয়া সম্ভব নয়। যত অবিশ্বাস্যই হোক শারিয়াতে ওই আইনই লেখা আছে। ধর্ষণের মামলায় চারজন বয়স্ক মুসলমানের চাক্ষুষ সাক্ষ্য ছাড়া ঐ হতচ্ছাড়া নারীখেকো পুরুষকে শাস্তি দেয়া ইসলামী আইনে সম্ভবই নয়। আর, নালিশ করতে এসে স্বীকারোক্তি অথবা অন্তঃসত্বা হবার কারণে ধর্ষিতা হতভাগিনীর কপাল পোড়ে। কারণ ওভাবে সে "অপরাধী" হিসেবে প্রমাণিত হয় এবং আদালতে শাস্তি পায়। মোল্লারা যত মূর্খ-ই হোক, শারিয়ার আইন নিয়ে খেলা করার মত বুকের পাটা ওদের বাপেরও নেই। ওরা শুধু ভক্তিভরে তা-ই প্রয়োগ করে যা শারিয়াতে লেখা আছে। সেজন্যই একই আইনে বাংলাদেশের ধর্ষিতা বালিকারা অবিবাহিতা হওয়ায় জুতো আর চাবুক খেয়েছে

আর নাইজিরিয়ার আমিনা লাওয়াল, পাকিস্তানের জাফরান বিবি বিবাহিতা হওয়ায় পেয়েছে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড।

"ডেভিড ফিনকেল, ওয়াশিংটন পোষ্ট ষ্টাফ রাইটার, রবিবার নভেম্বর ২৪, ২০০২, পৃষ্ঠা এ-০১- (বাচ্চাসহ আমিনা লাওয়ালের ছবির নীচে লেখা আছে- ভাবানুবাদ):- আমিনা লাওয়াল, যাকে সন্তান জন্মের পরপরেই মৃত্যুদন্ড দেয়া হয়েছে। কিন্তু যে পুরুষ তাকে গর্ভবতী করেছে বলে সে কোরাণ ছুঁয়ে শপথ করেছে, সে ব্যক্তির কোনই শাস্তি হয়নি কারণ প্রয়োজনীয় চার বয়স্ক মুসলমান ব্যক্তি পাওয়া যায়নি যারা স্বচক্ষে এ সংসর্গ দেখেছে।"

এবার তাকানো যাক আমাদের প্রাক্তন দেশের দিকে, পাকিস্তান যার নাম। ১৯৭৯ সাল থেকে সেখানে শারিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারী আইন হিসেবে। "মধ্যপ্রাচ্যে নারী-অধিকার প্রতিরোধ কমিটি"-র নম্বর-৩, জুলাই ২০০২ বুলেটিন থেকেঃ- (ভাবানুবাদ- আরও বহু বহু যায়গায় এ ঘটনার বিস্তারিত উল্লেখ আছে):- পাকিস্তান, ১৭-ই এপ্রিল। (ধর্ষনের শিকার) জাফরান বিবিকে ইচ্ছাকৃত অবৈধ যৌনতার অভিযোগে প্রস্তরাঘাতে মৃত্যুদন্ড দেওয়া হইয়াছে। ১৯৮১ সাল হইতে নারী-সংগঠন এবং মানবাধিকার সংগঠনগুলি এই আইন রহিত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করিতেছে।

এ ধরণের মামলায় সম্প্রতি সুপ্রীম কোর্টের জজ-সাহেব জাফরান বিবিকে ছেড়ে দিয়ে বলেছেন, কুমারী বা বিধবাদের অন্তঃসত্বা হওয়াটাই শারীরিক সংসর্গের প্রমাণ নয়। জজ সাহেবের আসল যন্ত্রনাটা যে কোথায়, সেটা বোঝা যাবে তাঁর পুরো রায়টা পড়লে। জাফরান বিবিকে ছেড়ে দিতে তিনি পাগলের মত শারিয়ার যুক্তি খুঁজেছেন। শেষমেষ ওই বাহানাতেই জাফরান বিবি ছাড়া পেয়েছে, কারণ গরজ বড়ই বালাই। আন্তর্জাতিক চাপের নাম বাবাজী, সেখানে পাকিস্তানের হুঁকো নাপিতের ব্যাপার আছে। তা ছাড়া ওয়ার্লড ব্যাংক আর আই-এম-এফের সামনেও পাকিস্তানকে স্নো-পাউডার মেখে মুখটা দেখাতে হয়। যতদিন আন্তর্জাতিক চাপ গড়ে ওঠেনি, ততদিন নীচের দু'দুটো শারিয়া কোর্ট মৃত্যুদন্ড বহাল রেখে শারিয়ার জয়গান গেয়েছে। পৃথিবীব্যাপী তুমুল প্রতিবাদের পরেপ্রেক্ষিতে সুপ্রীম কোর্টে জাফরান বিবিকে মুক্তি দেয়া হলে বিশ্বে পাকিস্তানের ভাবমূর্তি উজ্বল হয়। পাকিস্তান তাতে করে এমন কিছু নাপাক-স্থান হয়ে যায় নি, বিশের সম্মানই পেয়েছে। অর্থাৎ শারিয়া ইসলামের এমন কিছু লক্ষ্মণরেখা নয়, ওটাকে বাদ দেয়া সম্ভব এবং বাদ দিলে ইসলামের দাবী যে মানবাধিকার, সেটা রক্ষিতই হয়। এগুলো আমাদের গ্রাম বাংলার মুর্খ মোল্লার অপকর্ম নয়, এ হল দু-দু'টো ইসলামী দেশের শারিয়া কোর্টের রায়। আজ এগুলো ঘটতে পারছে কারণ গতকাল এবং গত পরশু আমাদের বাপ-চাচারা এ দানবকে উচ্ছেদ করেননি। আজ যদি আমরাও অলস বসে থাকি তবে আগামী কাল, পরশু এবং অনন্তকাল ধরে এ কালনাগ আমাদের কন্যাদের ওপর ক্রমাগত তার মরণছোবল দিতে থাকবে, অগণিত নিরপরাধ অত্যাচারিতার দীর্ঘশ্বাসের অভিশাপে ভারাক্রান্ত হতে থাকবে আমাদের ভবিষ্যত ইতিহাস।

এসব নিষ্ঠুরতার জন্যই শারিয়া পৃথিবীর ভয়ংকরতম আইন, শারিয়া ভিত্তিক রাজনৈতিক ইসলাম, অর্থাৎ জামাত হল পৃথিবীতে মানব-সমাজকে বিভক্তকারী হানাহানি ফিৎনা সৃষ্টিকারী ভয়ংকরতম ধর্ম-বিশ্বাস। "আর ধর্মের ব্যাপারে ফিৎনা সৃষ্টি করা নরহত্যা অপেক্ষাও মহাপাপ" - সুরা বাক্বারা আয়াত ২১৭।

অতঃপর, একজন বিবেকবান মানুষ হিসাবে, বেত্রাঘাতে প্রস্তরাঘাতে জর্জরিতা নিরপরাধ ভগ্নীর প্রিয় ভগ্নী ও ভ্রাতা হিসাবে আর কোন কোন প্রমাণ তুমি অস্বীকার করিবে?

****